ইউনিট ৭

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত লাভ করবেন।
- প্রবন্ধের উদাহরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করবেন।
- নিজে নিজে প্রবন্ধ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রবন্ধের সংজ্ঞার্থ, রূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রবন্ধ রচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা

প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। প্রবন্ধ শব্দের পরিবর্তে আমরা অনেক সময় রচনা শব্দটিও ব্যবহার করি। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে জানা অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি দক্ষতা। এ জন্য প্রবন্ধ/রচনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত জরুরি।

সংস্কৃতি প্রবন্ধ শব্দটি দ্বারা 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' আছে যার এমন রচনাকে বুঝায়। বাংলাতেও মোটামুটিভাবে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধ শব্দটির অর্থে যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা এই যে এটি কোন শিথিল ভাবে বিন্যস্ত রচনা নয়। এটি অশিথিল অর্থাৎ আটোসাঁটো বিধিবদ্ধ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অধুনা গদ্যে রচিত লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তি প্রয়োগে প্রখর রচনাকেই বোঝায়। প্রবন্ধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত। যদিও এর প্রকৃতি ঠিক প্রবন্ধের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না।

প্রবন্ধ সাহিত্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) চিন্তাশ্রিত প্রবন্ধ (২) ভাবাশ্রিত প্রবন্ধ। প্রথমটিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্বই প্রধান কিন্তু দ্বিতীয়টিতে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব প্রাধান্য পায়।

কিভাবে রচনা লিখতে হয়?

সব কাজের জন্যই পরিকল্পনা প্রয়োজন। আপনার প্রবন্ধ রচনার জন্যও পরিকল্পনা করুন। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি আছে তা কাগজ কলমে লিখে ফেলুন। সেই সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কি মনোভাব তাও ভেবে দেখুন।

রচনার তিনটি প্রধান অংশ

আপনার প্রবন্ধকে তিন ভাগে ভাগ করুন। ক) ভূমিকা বা সূচনা খ) মূল বিষয় গ) উপসংহার। ভূমিকা অংশ দিয়ে প্রবন্ধের বিষয়ের অবতারণা করা হয়। ভূমিকায় তথ্য প্রধান নয় এখানে ভাবটিই প্রধান তবে ভাবটি এমন হতে হবে যা বিষয়বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। সব সময়ই ভূমিকাকে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে লেখার চেষ্টা করুন।

ভূমিকার পরে মূল বিষয়। এ অংশে তথ্যগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিন। একটির পর একটি তথ্য সাজিয়ে নিন। প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ করুন। যুক্তি তর্ক বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছু বলবার সবই এখানে বলে নেবেন। সবশেষে আসবে উপসংহার। ভূমিকায় যার প্রস্তাবনা করা হয়েছিল- উপসংহারে হয় তার সকল সমাপ্তি। উপসংহারে বিষয় সম্পর্কে আপনার মতামত বা সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রবন্ধের ভাষা

প্রবন্ধ বা রচনার ভাষা হবে সহজ সাবলীল, প্রাঞ্জল ও গতিসম্পন্ন। ভাষা যদি হয় আড়ষ্ট তাহলে লেখকের মনোভাব সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় না। জটিল অথবা অনাবশ্যক দীর্ঘ বাক্য অলঙ্কার বহুল বাক্য, সমাজবহুল অপরিচিত শব্দ প্রবন্ধে ব্যবহার না করাই ভাল। ভাষার প্রাঞ্জলতা একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আপনি সে ভাবেই লিখুন।

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ কঠোরভাবে পরিহার করবেন বানান যাতে ভুল না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন।

উদ্ধৃতি

প্রবন্ধে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতি দিলে প্রবন্ধের মান বেড়ে যায়। কিন্তু কখনও ভুল বা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োগ করবেন না। উদ্ধৃতি যাঁর রচনা থেকে গৃহীত তার শুদ্ধভাবে লিখতে হবে।

রচনার দৈর্ঘ্য

রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। অতিশয় ছোট অথবা অতিদীর্ঘ রচনা পরিহার করবেন।

প্রবন্ধ/রচনার নমুনাগুলো ভাল করে পড়ুন

নমুনামূলক রচনার পড়ে অনুসারী রচনা নামে কিছু রচনার উল্লেখ আছে। মূল রচনার সাহায্যে একই রকম রচনা নিজে নিজে লিখুন।

প্রবন্ধ/রচনার নমুনা

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

কবি বলেছেন– "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

বাংলাদেশের প্রশস্তি এত সহজ ও মধুর করে আর কোন কবি রচনা করেছেন বলে আমরা জানিনা। বাংলাদেশের রূপ মাধুর্যে মোহিত কবির এ এক অসাধারণ বর্ণনা। বাংলার প্রকৃতির কত বৈচিত্র্য, কত রূপ, কত মাধুর্য। একেক ঋতুতে তার একেক বৈভব, একেক বৈশিষ্ট্য। ঋতুর রঙ্গমঞ্চে এক একটি ঋতু আসে আর চলে যায়। কিন্তু সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায় এ দেশের মানুষের মনে। ঋতুকে নিয়ে কবিদের তাই ক্লান্তি নেই। কবিতায়, গানে, গাথায় তার বহুবিচিত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানকার মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতেও পাওয়া যাবে ঋতুবৈচিত্র্যের নানা প্রভাব।

ঋতুচক্রের আবর্তনের প্রকৃতিতে একে একে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। ষড়ঋতুর প্রকৃতি রূপ, রঙ, রস, লীলা, চাঞ্চল্য প্রত্যেকটি ঋতুরই একান্ত আলাদা। ঋতু পরিক্রমার সূচনা হয় গ্রীষ্মকে নিয়ে। পঞ্জিকার পাতায় বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মের পরিধি। রুদ্র রোদ্রের দাবদাহে প্রকৃতি এখন ভীষণ রুক্ষ। কঠোর দহন জ্বালা সর্বত্র। ঝাঁঝালো বাতাস, আদি অন্তময় নীল আকাশ, জীব জগৎ এর প্রাণান্ত অবস্থা। গ্রীষ্ম যত কঠিন ও কঠোর হোক না কেন – এ ঋতু মধুময় ঋতু। এ সময়ই বাংলাদেশের মধুময় ফলসম্ভারের কাল। তাপদগ্ধ মানুষের রসনায় আম, কাঁঠাল জাম আর নানান ফলের সম্ভার এনে দেয় স্বর্গীয় আনন্দ। তীব্র রোদকে পান করে এ সময় ফোটে চম্পা। আরও কত ফুল। হঠাৎ কখনও ঈশান কোণে দেখা দেয় কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ। দেখে মানুষ পুলকিত হয়। হঠাৎ কখনও অন্ধবেগে নেমে আসে ঝড় – যার প্রকৃত নাম কালবৈশাখি। ভাঙে ঘর, ভাঙে বাড়ি, উড়ে যায় ছিন্নপাতা, সর্বস্ব হারায় কেউ। কাল বৈশাখির সঙ্গে নেমে আসা এক পশলা বৃষ্টি প্রাণে বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির পরশ।

গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। হঠাৎ করে এক দিন কাল মেঘের নিশান উড়িয়ে, ডম্বরু বাজিয়ে যেন দখল করে নেয় গ্রীষ্মের রাজ্য। দুঃসহ গরম আর ক্লান্তির বদলে বর্ষার অবিরল ধারা প্রকৃতির বুকে এনে দেয় স্বস্তি ও শান্তির প্রলেপ। ফসলের ক্ষেত, তরু-লতা, জীবজগৎ যেন নতুন করে প্রাণারন্দন খুঁজে পায়। কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বর্ষার চিত্র এঁকেছেন এভাবে–

"নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর
কালিমাথা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বর্ষা ঋতু বাংলাদেশের প্রাণ। ফসলের সম্ভার দেখা দেয় মাঠে মাঠে। প্রসন্ন দৃষ্টিতে কৃষক চোখ মেলে তাই দেখে। নগরে, বন্দরে, শহরে কাজকর্মে চঞ্চলতা কমে যায়। কোন কোন সময় মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় অতি বর্ষায়।

শরৎ ঋতু প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতার ঋতু। বর্ষার পরে প্রকৃতি শান্ত। বৃষ্টির একঘেয়েমি আর নেই। নীল উজ্জ্বল আকাশ। সেখানে হালকা মেঘের ভেলা। রাতে চাঁদের আলোয় যেন বাঁধ ভাঙে। নদীর ধারে কাশ ফুলের হাসি। শরৎ উৎসবের ঋতু। এ ঋতুতেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসবগুলো। শরৎ বাঙালির প্রাণের ঋতু – আনন্দের ঋতু।

শরতের অবসানে আসে হেমন্ত। সোনার রঙে রাঙানো হেমন্ত। হৈমন্তিক ধান এ সময়ের প্রধান ফসল। সারা বছরের অন্ন আহরণ শুরু হয়েছে। বহু দিনের প্রতীক্ষিত ফসল ঘরে উঠেছে। নবান্নের সমারোহ আজ ঘরে ঘরে। হেমন্ত এক অর্থে ধূসরতা ও রিক্ততার ঋতু। কিন্তু হেমন্তের অগমন মানুষের মনে জানায় এক অজানা আনন্দের আভাস।

শরতের পরেই ঋতুর নাট্যমঞ্চে অবির্ভাব ঘটে শীতের। এ ঋতু স্নিগ্ধ নয়, বলা চলে রুদ্র। হিমেল হাওয়া আর কুয়াশায় মোড়া শীত জানিয়ে দেয় আতঙ্কের বার্তা। শীতের তীব্রতায় জীবন থমকে দাঁড়ায়। ম্রিয়মান সূর্যের আলো সবটুকু উত্তাপ দিয়েও শীতের হিমেল ছোঁয়া থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে না। তাই জামার উপরে জামা তার উপরে শীত বস্ত্রের সন্ধান। শীতার্ত মানুষ এ সময় বড় কষ্ট পায়। অনেক ক্ষেত্রেই জোটে না শীতবস্ত্র।

শীত বাঙালির আরাম আয়েস করে পুলি পিঠে খাওয়ার ঋতু। এ সময় নানা রকম রঙের বাহারী ফুল ফোটে গাঁদা, গোলাপ এমন আরও কত কি!

বসন্ত দূরে নয়। শীতের পরেই তাই বসন্ত আসে। বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা। ফুলে, ফলে, নব কিশলয়ে সত্যি বসন্ত ঋতুর রাজা। কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় এ সময়ই। প্রকৃতির রাজ্যে বসন্ত যেন এক মহাউৎসবের প্রতীক।

উপসংহার ঃ প্রকৃতি ও মানুষ যে কত কাছাকাছি - বাংলাদেশের ষড়ঋতুর দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ঋতুর আলাদা আলাদা রূপ, বৈভব ও ঐশ্বর্য। এদের বৈচিত্র্য আমাদের জীবনধারাকে বদলে দিয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এগুলোর আছে ারষ্ট ছাপ। ঋতুর বদল আমাদের রুচি বদলায় এঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। কখনও যুদ্ধ করে ঠকতে শেখায়, কখনও প্রশান্তিতে আমাদের বুক ভরিয়ে দেয়। এই ষড়ঋতুর দোলায় আমরা সবাই দুলছি। এই ষড়ঋতুর আশীর্বাদ যেন ভবিষ্যত জীবনেও আমাদের সঙ্গী হয়।

অনুসারী রচনা

- বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
- বাংলাদেশের প্রকৃতি

বাংলাদেশের বর্ষা

সূচনা ঃ গ্রীষ্মের খরদাহে পৃথিবী যখন দগ্ধ ও দিশেহারা তখনই বাংলাদেশে বর্ষা আসে তার স্নিগ্ধ কোমল রূপ নিয়ে। প্রকৃতির রাজ্যে বর্ষা আসে বালিকার প্রগলভ রূপ নিয়ে। বালিকার খলখল হাসির ঝর্ণাধারার মতই বৃষ্টির বর্ণাধারা নেমে আসে সবাইকে হতচকিত ও বিম্নিত করে। বর্ষা বাংলাদেশের প্রাণ। বর্ষা আসে সগৌরবে, আসে ঘোষণা দিয়ে আর মুহূর্তের মধ্যে জয় করে ফেলে গ্রীষ্মের দারুণ দুঃসহময় দাপটকে অগ্রাহ্য করে।

আমাদের দেশে ঋতুর নাট্যমঞ্চে ছয়টি ঋতুর আনাগোণা। কিন্তু পঞ্জিকার পাতায় নয়, প্রকৃতিতেই যে কটি ঋতু ারষ্টভাবে তার রূপ নিয়ে আবির্ভুত হয় বর্ষা তাদের একটি। বর্ষা এত ারষ্ট যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না যে এটা বর্ষা।

বর্ষার বর্ণনা ঃ গ্রীষ্মের তীব্র তীক্ষ *রোদ আর নেই। পাখির নরম পালকের রঙের মত মেঘের আনাগোনা সারা* আকাশ জুড়ে। তারপর কখন যেন নেমে আসে ঝরঝর অবিরল বৃষ্টির ধারা। কবির ভাষায়–

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর

আউশের ক্ষেত জলে ভরভর

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বর্ষার আগমনে সর্বত্রই যেন একটি আনন্দ শিহরণ বয়ে যায়। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে ঘরবন্দী হয়ে পড়ে। খুব প্রয়োজনীয় কাজ না হলে অঝোর বৃষ্টিধারায় কেউ বের হতে চায় না। বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত্র বর্ষায় আন্দোলিত হয়। প্রাণ প্রাচুর্য যেন সীমাহীন করে দেয় এ বর্ষা। তরু-লতা, বৃক্ষ বৃষ্টিস্নাত হয়ে যেন মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। খামখেয়ালি বাতাস মাঝে মাঝে আরও তরু, বৃক্ষকে দুলিয়ে দিয়ে যায়।

বর্ষার নদ-নদী, খালবিল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সকল বাধা অতিক্রম করে জল ছলছল শব্দ করে ছুটে যায় সাগরের দিকে। নদীর পানি উপচে ঢুকে পড়ে মানুষের আবাসস্থল গ্রামে ও শহরে। কখনও নদী ও লোকালয় একাকার হয়ে যায় বন্যার প্রবাহে। গ্রামে নৌকাই একমাত্র বাহন। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে প্রয়োজন হয় নৌকার।

বর্ষার উপকার ঃ বর্ষা আমাদের অনেক উপকার করে। বর্ষার এই অঢেল বৃষ্টি না থাকলে বাংলাদেশে ফসলের এত সম্ভার উৎপন্ন হতো না। এ বর্ষার জন্যই দেশে এত গাছগাছালি জন্মান সম্ভব হয়েছে। বর্ষায় জলস্ফীতির কারণে নৌপথের চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বর্ষার প্রকৃতির আমাদের দেশকে দিয়েছে ভিন্ন একটি নৈসর্গিক চিত্র। বর্ষায় জলমগ্ন বাংলাদেশ ভিন্ন একটি রূপ ও বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে। এসব মিলিয়ে বর্ষা আমাদের খুব প্রিয়।

অপকার ঃ বর্ষা শুধু আমাদের উপকারই করে না – কিছু অপকারও করে। অতিবর্ষা আমাদের অনেক দুঃখ কষ্টের কারণ। অতিবর্ষার ফলে বন্যা হয়। এ বন্যা ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে ঘরবাড়ি ভেঙে সংসারকে তছনছ করে দেয়। অনেক সময় নদীর তীর ভেঙে যায়– হাজার হাজার মানুষ হয় গৃহহারা। তাছাড়া বন্যা বেশি হলে অনেক লোকালয় তলিয়ে যায় পানিতে। তখন সেখানকার মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় অন্যত্র কোন শহরে অথবা বন্দরে। বন্যা পরবর্তীকালে নানা রকম পানিবাহিত পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

বর্ষায় কাজকর্মও বিঘ্নিত হয়। বন্যা অথবা অতিবর্ষণ হলে অফিস আদালত স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। হাট বাজার ঠিকভাবে চলে না। নানান ধরনের কর্মজীবী মানুষ বিশেষ করে দিন এনে দিন খায় এমন পেশার মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ।

উপসংহার ঃ বর্ষার কিছু অসুবিধার দিক থাকলেও বর্ষাই আমাদের দেশের প্রাণশক্তি। সারা বৎসরের অন্ন সংস্থান এ বর্ষা করে দেয়। ধান, পাট, ফসলের ক্ষেত দেখে বুক ভরে যায় কৃষকের। কদম, কেয়া, চামেলি, জুঁই বর্ষার ফুল। আমাদের প্রতিদিনের সাদামাঠা জীবনের চালচিত্র বদলে দেয় বর্ষা। বৃষ্টি স্নিগ্ধ দুপুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য আয়োজন হয় খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। সব কিছু মিলিয়ে বর্ষা বাঙালির প্রিয় ঋতু।

অনুসারী রচনা

- একটি বর্ষার দিন
- আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা
- আমাদের জীবনে বর্ষা

বাংলাদেশের কুটির শিল্প

সূচনা ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ। এমন এক দিন ছিল যখন অন্নাভাব, দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবিকার তাড়না এত প্রবল ছিল না। মোটা কাপড় পরে, মোটা ভাত খেয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারত। মানুষের চাওয়া পাওয়াও ছিল অল্প। সেই সব দিনে জীবিকা হিসাবে নয় সৌখিন শিল্প হিসাবে মানুষ নানা সামগ্রী প্রস্তুত করতে শেখে। বৃত্তি ও জীবিকার প্রয়োজনে ঘরে বসে তৈরি করা এ সব শিল্প সামগ্রীই কুটির শিল্প হিসেবে পরিচিত।

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা ঃ নিজের কুটিরে বসে মানুষ যে সামগ্রী তৈরি করে তাই কুটির শিল্প। প্রয়োজনের জন্য মানুষ নানা রকম গৃহসামগ্রী তৈরি করে। এতে সৌন্দর্য ও মনের মাধুর্য মিশ্রিত একটি শিল্পী সত্তা প্রকাশিত হয়। শিল্পীর হাতের নৈপুণ্য ও চারুত্ব সৃজনী শক্তির দক্ষতা সাধারণ বস্তুকেও অসাধারণত্ব দিয়ে থাকে। আদি যুগে মানুষের শিল্পবোধ হয়তো এভাবেই জাগ্রত হয়েছে।

কুটির শিল্প অতীত ও বর্তমান ঃ অতীতে বাংলাদেশের গ্রামগুলো ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষী কৃষিকাজ করতো, তাঁতি কাপড় বুনতো, কামার গৃহস্থালী ও কৃষির যন্ত্র যোগাত, কুমোর মাটির নানা রকম সামগ্রী বানাতো, স্বর্ণকার বানাতো নানা রকমের অলঙ্কার, কৃষি সম্ভারের সঙ্গে এগুলোর অনেক কিছু সেকালে বিদেশে রপ্তানী হতো। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি সৃষ্টি হয়েছিল জগৎ জোড়া। কিন্তু বাংলার কুটির শিল্পের এ অনন্য গৌরব ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। আঠার শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে যন্ত্র সভ্যতার দ্রুত প্রসার হতে থাকে। যন্ত্র সভ্যতার কাছে কুটিরশিল্প ক্রমাগত মার খেতে থাকে। তার কারণ হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে উৎপাদন করা সম্ভব হতো। হাতের দক্ষতা যতই থাকনা কেন উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল ধীর ও এটি ব্যয়বহুল। ফলে কম খরচে মানুষ জিনিসপত্র পেতে শুরু করে ও অচিরে কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যায়।

এছাড়া বিদেশী শাসক ইংরেজরা সুকৌশলে এদেশের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। নিজেদের ব্যবসায়িক প্রাধান্য রক্ষা করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ইংরেজরা এমনকি মসলিন শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য মসলিন তাঁতিদের হাত কেটে দিতেও দ্বিধা করেনি।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের পরিচয় ঃ কুটির শিল্পে বাংলাদেশের হারানো গৌরব হয়ত আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও কখনও বিস্মৃত হওয়া যাবে না। এখনও আমাদের দেশে নানা রকম কুটীর শিল্প প্রচলিত আছে। এর মধ্যে, মৃৎশিল্প, তাঁত, অলঙ্কার তৈরি করা, বিভিন্ন ধাতুর শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প প্রধান। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে শিল্পীরা অনেক নয়ন মনোহর শোভন সামগ্রী তৈরি করেন। সোনা-রূপা দিয়ে দিয়ে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার তৈরি করে স্বর্ণশিল্পীরা। পিতল, কাঁসা এগুলোর ব্যবহারও কুটির শিল্পে আছে। পাট ও আখের ছোবড়া দিয়ে বৈচিত্র্যময় অনেক সামগ্রী তৈরি করা যায়।

কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ঃ বড় বড় শিল্প যদিও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে তবুও কুটীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও কমেনি। শুধু ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে নয়, কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে অনেক নর-নারীকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা যায়। কৃষিজীবীরা বছরের অধিক সময় বসেই বাড়িতে তাদের বাড়তি আয়ের একটি সুযোগ করে নিতে পারে। কুটির শিল্পকে আরও মনোগ্রাহী করা যেতে পারে ও এর উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব। ফলে আধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে কুটির শিল্প আরও কাম্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা ঃ জাতীয় উন্নয়নে কুটির শিল্প একটি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। কুটীর শিল্পের প্রসার হলে বেকারত্ব যেমন কমবে তেমনি জাতীয় আয়ের কিছুটা সুষম বন্টন ঘটবে। বিদেশে কুটির শিল্পের যথাযথ বাজারজাতকরণ ও নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। ফলে রপ্তানী অনেক গুণ বেড়ে যাবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সহায়ক ভূমিকা কুটির শিল্পের জন্য প্রসারিত করতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষ কারিগরি উৎকৃষ্ট

কুটির শিল্পকে নতুন সম্ভাবনা দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য কুটির শিল্প একটি বড় ধরনের খাত হতে পারে।

কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঃ কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য জনসচেতনতা দরকার। সেই সঙ্গে কিছু সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। যেমন কুটীর শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কুটির শিল্পের উপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাজন ও মধ্যবর্তী দালালদের হাতে কুটির শিল্পের কারিগরগণ না পড়েন তার তদারকি করতে হবে। কুটীর শিল্পকে যন্ত্রশিল্পের মতই সব রকমের সুযোগ ও গুরুত্ব দিতে হবে। কুটির শিল্পের কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার ঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশের জন্য কুটির শিল্প অত্যন্ত প্রয়োজন। বৃহদাকার শিল্পের ব্যাপক শিল্পায়ন সময় সাপেক্ষ ও আর্থিক ব্যাপার। কিন্তু কুটির শিল্পে খুব সহজে ও অল্প ব্যয়ে আমরা এর প্রসার ঘটাতে পারি। সুতরাং জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থে কুটির শিল্প উন্নয়নে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অনুসারী রচনা

কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ

কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ভূমিকা ঃ আজকের পৃথিবী বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান ছাড়া এখন সমাজ ও জীবন কোন কিছুই আমরা ভাবতে পারি না। নতুন নতুন আবিষ্কার ও জ্ঞান শাখার উন্মোচন বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে করেছে তীব্র গতিময়। বিজ্ঞান আমাদের কোন দূর-দিগন্তে নিয়ে পৌঁছাবে আমরা জানিনা। আমরা শুধু একথাই এখন জানি-বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী ও সহচর।

আদিমকালে মানুষ ছিল অসহায়। বৈরী প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা করতে শুরু করেছে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মানুষ দেখেছে প্রকৃতি শক্তিশালী বটে তবে জ্ঞান তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। এবোধ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মানুষ বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আধুনিক সভ্যতা এ বিজ্ঞানেরই অবদান।

বিজ্ঞানে অবদান ঃ মানুষ শুধু চাঁদেই পৌঁছেনি – তার অভিযান চলছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞান মানব কল্যাণে রেখেছে অভূতপূর্ব অবদান। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের জীবনকে দিয়েছে আমূল বদলে। রেডিও, টেলিভিশন, কৃত্রিম উপগ্রহ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব জীবনদায়িনী ওষুধের আবিষ্কার, সার্জারির বিস্ময়কর উন্নয়ন মানব জীবনকে দিয়েছে অমৃতের সন্ধান। বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবীর কোন দেশ সমাজ অথবা মানুষ কেউ দূরবর্তী নয়। বলা হচ্ছে পৃথিবী এখন পরিণত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি পৃথিবীব্যাপী এ নব সভ্যতার সূচনা করেছে। এ সভ্যতা বিজ্ঞানের অবদান।

বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ঃ মানুষ এক সময় ছিল প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক। প্রকৃতির রুদ্র তান্ডব সমাজবন্ধ মানুষের সংসারকে করেছে ছিন্নভিন্ন। মানুষ এ প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। এ প্রকৃতিরই আরেক রূপকেও মানুষ দেখেছে। প্রকৃতির রূপ, লীলা ও সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছে – তার রহস্য ভেদ করার কৌতূহল জেগেছে মনে। যেদিন পাথকে পাথর ঘষে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে সেদিনই মানুষ এক মহৎ আবিষ্কার করেছে। সেদিনের সেই আবিষ্কারই মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে বিজ্ঞানের এক মহা কালজয়ী উপাখ্যান সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ বহুমুখী ও অবারিত।

বিজ্ঞানের অকল্যাণকর দিক ঃ বিজ্ঞান কি শুধু মানব সমাজে কল্যাণই বহন করে এনেছে; নাকি কিছু অকল্যাণকর দিকও এর আছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে বহু কিছু দিয়েছে, কিন্তু এ পৃথিবীকে ধ্বংসের উপাদানও সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। আজ হাইড্রোজেন ও আনবিক বোমার ভয়ে মানুষ আশঙ্কাগ্রস্ত। কত রকমের ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, জীবানু ও রাসায়নিক আক্রমণে গোটা মানবজাতি বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে – তার চেয়েও হাজার গুণ ক্ষয়ক্ষতি হবে যদি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়। শুধু ক্ষয়ক্ষতিই নয়, হয়তো মানবজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের এ বিভীষিকা মানুষের শান্তি হরণ করেছে।

আধনিক জীবন ও বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞান যদি মানব জীবনকে সমৃদ্ধ না করতো তবে আধুনিক জীবন কল্পনাও করতে পারতাম না। বিজ্ঞান জীবনে এনেছে সৌন্দর্য, আনন্দ ও বৈচিত্র্য। সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ পোশাক-আশাক থেকে আরম্ভ করে, সুদৃশ্য বহুতল অট্টালিকা, জীবন যাপনের নানাবিধ উপকরণ, বিনোদনের নানা সুযোগ এগুলোর কোনটিই সম্ভব হত না যদি বিজ্ঞানের কল্যাণকর আবিষ্কার হত। একটি আলপিন থেকে বৃহদাকার যন্ত্র সবই বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর সবই মানব জীবনের জন্য। কিন্তু এ বিজ্ঞানই কি আমাদের ধ্বংস করবে? একদিন বিনা চিকিৎসায়, ওষুধের অভাবে যে রোগে মানুষ মারা যেতো আজ আর তা হয় না। দুরারোগ্য ব্যাধিকে বিজ্ঞান আরোগ্যযোগ্য করেছে। সার্জারির বিপুল উন্নয়ন মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে – দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। এমনি কত শত আবিষ্কার মানুষের জীবনকে করেছে সহজ ও আনন্দময়। যে বিজ্ঞানের কাছে আমরা ঋণী, সেই বিজ্ঞানের দ্বারা কেন আমাদের জীবন নাশ হবে? কেন মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে? এ প্রশ্ন আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের।

উপসংহার ঃ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়- সভ্যতাও বিনাশ করতে চায় না। বিজ্ঞানের যে অমিত শক্তি তার প্রয়োগকারী মানুষ। মানুষের শুভবুদ্ধিই পারে বিজ্ঞানের ধ্বংস যজ্ঞকে বন্ধ রাখতে। যে ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায় সেই ডিনামাইট দিয়েই পাহাড় কেটে রাস্তা করে রেলপথও বসান যায়। আমরা কোনটি করবো – এটাতো আমাদের ব্যাপার। তাই দোষ বিজ্ঞানের নয় – দোষ প্রয়োগের। এ জন্য আমরা বলবো বিজ্ঞান কখনও অভিশাপ নয় – বিজ্ঞান সব সময়ই আর্শীবাদ।

অনুসারী রচনা

- বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা
- মানব কল্যাণে বিজ্ঞান
- বিজ্ঞান অভিশাপ না আর্শীবাদ

দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা ঃ আদিমকালে মানুষ ছিল অসহায়। পৃথিবীর পরিবেশ ছিল জীবন যাপনের জন্য অনুপযোগী-প্রকৃতি ছিল চরম বৈরী। অসহায় মানুষ প্রতিদিন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থেকেছে। এক্ষেত্রে মানুষই ছিল মানুষের প্রধান সহায়। প্রকৃতির শক্তি ও সৌন্দর্য, দুটোই মানুষকে অভিভূত করেছে। মানুষ প্রথম পর্যায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরে সে বিষয়টি চিন্তা করতে শিখেছে। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ প্রথম জ্ঞান লাভ করেছে।

বিজ্ঞান শব্দটির তাৎপর্য ঃ বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে বিশেষায়িত জ্ঞান দিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করেছে তাই বিজ্ঞান। মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। যেদিন থেকে কৌতূহলের জাগরণ সেদিন থেকে মানুষ থেমে নেই। জ্ঞানের সাধকগণ একের পর জ্ঞানের জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রকে আবিষ্কার করে চলেছে।

সমাজ ও জীবনে ঃ মানুষের বিজ্ঞান সাধনা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে মানুষের সমাজ ও জীবনে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে মানুষের সমাজ, তার জীবন ও চিন্তাধারা। বিজ্ঞান আজ প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, গৃহে অথবা কর্মক্ষেত্রে, পথে-ঘাটে, লেখাপড়ায়, যে কোন

অনুষ্ঠান অথবা বিনোদনে সর্বত্র বিজ্ঞানের অবদান ও আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করে দিয়েছে সহজ, অনায়াস ও সুন্দর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে সেটি বিজ্ঞানের অবদান, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে তার পিছনেও বিজ্ঞান। কম্পিউটারে কম্পোজ হচ্ছে, ইন্টারনেটে সংবাদ আদান প্রদান হচ্ছে, টেলিফোনে দূরে লোকের সঙ্গে কথা বলছি, টি.ভি-তে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের ঘটনার বিবরণ ও দৃশ্য দেখছি এমনি কত অবিশ্বাস্য ঘটনা বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে এবং সেগুলো জীবনের সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞান আমাদের জীবন যাপনকে সাহায্য করছে।

গৃহস্থালীর কাজে বিজ্ঞান ঃ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গৃহস্থালীর যত কাজ সবকিছুই বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গৃহস্থালীর জন্য বিজ্ঞান যে কত উপকরণ তৈরি করেছে তার যথার্থ হিসেব দেওয়া কষ্টকর। এলার্মঘড়ির শব্দ ঘুম ভাঙে, ঘুম ভাঙার পরে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজি, ইলেকট্রিক হিটারে কিংবা গ্যাসের চুলায় তৈরি হয় চা-চা খেতে খেতে সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া সব কিছুর পিছনেই আছে বিজ্ঞান। সকালে নাস্তার উপকরণ বেরিয়ে আসে ফ্রিজ থেকে। গৃহের প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার জমা আছে ফ্রিজে। ঘরে কল ঘুরালে পানি আসে, তেল সাবান, জুতা ছাতা কোথায় বিজ্ঞান নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞান। আর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমরা বিজ্ঞানের অবদানে জীবনকে করছি সহজ ও সুন্দর।

শুধু নাগরিক জীবনেই নয় গ্রামের মানুষের কাছেও বিজ্ঞান আজ নিত্যসঙ্গী। নাগরিক অনেক সুবিধাই অবশ্য আজ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাছাড়াও গ্রামের মানুষ বিজ্ঞানের সুবাদে আজ ব্যবহার করছে রাসায়নিক সার, কৃষিকাজের জন্য পাম্পসেট, হাস্কিং মেশিন, ট্রাক্টর, উচ্চ ফলনশীল বীজ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের সান্নিধ্যে এসে মানুষ এখন আর সেই পুরানো দিনে কৃষি ব্যবস্থায় নির্ভরশীল নয়। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্রই আজ বিজ্ঞান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ঃ মানুষের জীবনকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিন বিজ্ঞানের কত অবদানই না আমরা ব্যবহার করছি। আমরা পথ চলছি বৈদ্যুতিক ট্রেনে, আকাশে উড়ছি প্লেনে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করে চলেছে জাহাজ, পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হচ্ছে, উষ্ণ মরুভূমি হয়ে উঠছে সুজলা সুফলা, নদীর গতি পরিবর্তন করে তৈরি হচ্ছে বাঁধ, নদী পারাপারের জন্য তৈরি হচ্ছে সেতু, আকাশচুম্বী ইমারতে আজ আমরা বসবাস করছি, কত রকমের কল কারখানায়, কত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে তৈরি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞান শুধু দেশকেই বদলে দেয়নি, বদলে দিয়েছে সমাজ, জীবন ও রুচিকে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে অত্যাশ্চর্য ওষুধ। মানুষ ফিরে পাচ্ছে জীবন। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে মানুষের দেহে অঙ্গ সংযোজন সম্ভব হচ্ছে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখার জন্য বুকের ভেতর পেসমেকার যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া, দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ সবই সম্ভবপর হয়েছে বিজ্ঞানের অবদানের ফলে। ক্যান্সার অথবা এইডস এর মত ঘাতক রোগেরও চিকিৎসা একদিন মানুষের করায়ত্ত্ব হবে বলে আমরা অনুমান করতে পারি।

উপসংহার ঃ সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনে কোন অঙ্গন নেই যেখানে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগেনি। বিজ্ঞানের যাদুরর্শে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে মধুময় ও সৌন্দর্যময়। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গী। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর ব্যবহার জীবনকে করেছে সুখ ও সমৃদ্ধময়। বিজ্ঞান জীবনে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। বিজ্ঞান আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী।

অনুসারী রচনা

- প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান
- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব
- মানব জীবন ও বিজ্ঞান
- নিত্যসঙ্গী বিজ্ঞান

টেলিভিশন

ভূমিকা ঃ টেলিভিশন বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য অবদান। বিজ্ঞানের যে সমস্ত আবিষ্কার মানব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত হরেছে টেলিভিশন তারই একটি। আমরা ঘরে বসেই দূরের জিনিসকে দেখতে পারি ও শুনতে পারি। এর আগে রেডিও আবিষ্কৃত হয়েছে তবে এর মাধ্যমে আমরা দূরের কথা শুনতেই পারতাম আর এখন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা তা দেখতেও পারি।

টেলিভিশন শব্দটি ল্যাটিন 'টেলি' ও 'ভিশন' শব্দদুটো থেকে এসেছে। 'টেলি' শব্দের অর্থ দূরত্ব ও 'ভিশন' শব্দের অর্থ দেখা। অর্থাৎ দূর থেকে যা দেখা হয় তাই টেলিভিশন। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা দূরের দৃশ্য দেখি ও কথা শুনতে পাই।

আবিষ্কার ঃ সর্বপ্রথমে জার্মান বিজ্ঞানী 'কন' বেতারে ছবি প্রেরণের কথা চিন্তা করেন। তাঁর অভিমত ছিল একটি ছবিকে ছায়া ও আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব ও তা দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। ধাপে ধাপে এর অনেক উন্নতি হয়েছে ও বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ব্যবহার ঃ ষাটের দশকেই আমাদের দেশে সীমিত আকারে টেলিভিশনের ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলই বাংলাদেশ টিভি নেটওয়ার্কের অধীনে এসেছে। টেলিভিশন বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যদিও টেলিভিশন এখনও ঘরে ঘরে পৌঁছায়নি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের গৃহে এখনও টি.ভি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবুও এর ব্যাপক ব্যবহার ক্লাব, প্রকাশ্য স্থান, বিদ্যায়তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহজলভ্য হয়েছে। ফলে টেলিভিশনের দর্শকও বেড়েছে।

সংবাদ, খেলাধুলা, নৃত্যগীত, নাটক, নানান ধরনের হাল্কা অনুষ্ঠান বাংলাদেশে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। এছাড়া কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, নানান ধরনের সতর্কতামূলক নির্দেশনা ইত্যাদি টেলিভিশনের উপযোগিতা অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। উন্নত দেশগুলোতে টেলিভিশন শুধু আনন্দের উপকরণ হিসেবে নয় শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবেও কাজ করছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের একটি সহায়ক পন্থা হিসেবে টেলিভিশনের ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হলেও বিকল্প ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় টেলিভিশন একটি বড় রকমের ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ব্যবহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল রাখবে বলে অনুমান করা যায়।

উপকারিতা ঃ টেলিভিশনের উপকারিতা বহুবিধ। জনমত সৃষ্টির জন্য এটি একটি চমৎকার মাধ্যম। জনকল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা যায়। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা একটি বড় অভিশাপ। দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতে টেলিভিশন একটি বড় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তথা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের একটি বিকল্প ধারা সৃষ্টি করতে পারে টেলিভিশন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই টেলিভিশন সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে।

টেলিভিশন এখন আমাদেরই জীবনেরই একটি অঙ্গ। সেক্ষেত্রে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে টেলিভিশন তার সাহায্যকারী ভূমিকা সহজেই রাখতে পারে।

অপকারিতা ঃ কোন জিনিসের অপব্যবহার হলেই তা সমাজের অপকার করে। শালীনতাবর্জিত ও কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান, নাটক, নৃত্যগীত সমাজে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ক্ষতি করে থাকে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হলে স্বাভাবিক কাজকর্ম, লেখাপড়া ইত্যাদির ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার প্রতি সার্বক্ষণিক আকৃষ্ট হলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। রোমাঞ্চকর বিদেশী ছায়াছবি ও অনুষ্ঠান দেখে যুব শ্রেণী বিপথগামীও হতে পারে। তাই অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা উচিত।

টেলিভিশন পর্দায় বেশিক্ষণ দৃষ্টিপাত করলে অনেকের দৃষ্টিশক্তির ও ক্ষতি হয়।

উপসংহার ঃ টেলিভিশন আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। টেলিভিশনের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে টেলিভিশন যেন সব সময় সমাজে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের

জীবনকে একদিকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে ও অন্যদিকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও রক্ষা করতে হবে। টেলিভিশনের শুভ প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ুক – এটাই সবার কাম্য।

অনুসারী রচনা

- টেলিভিশন ও আমাদের জীবন

কম্পিউটার

সূচনা ঃ বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই আমাদের সমানভাবে প্রভাবিত করে না। তবে এমন কিছু আবিষ্কার আছে যা ধীরে ধীরে মানুষের জীবন ধারাকেই বদলে দেয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমনি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এ যন্ত্রটির দ্রুত উন্নয়ন, এর উপযোগিতা, এর বহুমাত্রিক গুণ মানব সমাজের কর্মচিন্তা ও ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করে দিচ্ছে। নিত্য দিনের কাজকর্মে কম্পিউটার যেমন সাহায্য করছে তেমনি অফিস, আদালতের কাজে, জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার। আধুনিক মানব জীবনে কম্পিউটার তাই এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

পরিচিতি ঃ কম্পিউটার শব্দটি ইংরেজি। এর অর্থ হিসাবকারী যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা Data বা উপাত্ত গ্রহণ করতে পারে, অতি দ্রুত বিশ্লেষণ করতে পারে ও সিদ্ধান্ত দান করতে পারে। জটিল সমস্যা সমাধানে কম্পিউটারের দ্রুততা এতো বেশি যা মানুষের পক্ষে শারীরিকভাবে করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে কম্পিউটারকে শুধু হিসাবযন্ত্র বললে কম বলা হয়। যোগ, গুণ, ভাগ, যেমন এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, হলেও এর কর্মক্ষেত্র আরও বহুদূর প্রসারিত। তথ্যের বিশ্লেষণ করা, তুলনা করা ও সিদ্ধান্ত প্রদানে কম্পিউটার এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র।

কম্পিউটারের গঠন ঃ কম্পিউটারের গঠন মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত এর যান্ত্রিক সরঞ্জাম, অর্থাৎ যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার গঠিত, তাকে বলে হার্ডওয়ার। দ্বিতীয়ত, সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় সুশৃঙ্খল যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে বলে সফটওয়্যার। তথ্য সংরক্ষেণের স্মৃতি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জন্য গাণিতিক বা যুক্তি অংশ, তথ্য গ্রহণের জন্য প্রবেশ মুখ অংশ, ফলাফল প্রদর্শকের জন্য বহির্মুখ অংশ, নিয়ন্ত্রণ অংশ ইত্যাদি হার্ডওয়ারের অংশ। প্রোগ্রাম সাধারণত দু প্রকারের হয়- ব্যবহারিক প্রোগ্রাম ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম। সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত প্রোগ্রামকে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলে। পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় রক্ষা করে। একটি কম্পিউটারের পদ্ধতি হল যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও প্রোগ্রাম সামগ্রীর যৌথ সমন্বয়।

শ্রেণীবিভাগ ঃ অভ্যন্তরীণ গঠন, আকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি অনুযায়ী কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সুপার কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার। আকার, আকৃতি ও ক্ষমতায় পার্থক্য থাকলেও এগুলোর মৌলিক কাজ একই।

আবিষ্কার ঃ কম্পিউটারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাম্প্রতিক কালে ঘটলেও এর বর্তমান রূপে আসতে বহু বছরের শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েছে। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্লেইলি পাসকেল নামে একজন গণিতবিদ যোগ বিয়োগ করতে সক্ষম একটি গণনাযন্ত্র তৈরি করেন। ১৬৭১ সালে গডফ্রাইড লেবনিটজ গুণ ও ভাগ করতে সক্ষম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। ১৮১২ সালে চার্লস ব্যাবেজ ক্যালকুলেটরের মূলনীতির পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয়। ১৯৫৭ সাল থেকেই কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে কম্পিউটারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। যার ধারা আজও অব্যাহত। কম্পিউটার ইতোমধ্যেই মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বব্যাপী সমন্বিত চেষ্টায় এর আরও উন্নতি হচ্ছে। কম্পিউটার যন্ত্রের বিকাশ আরও কতদূর সম্প্রসারিত হবে তা বলা মুশকিল।

প্রয়োজনীয়তা ঃ কম্পিউটার আধুনিক বিশ্বের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় পর্যন্ত এর স্বগর্ব পদচারণা। মানুষের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার। কম্পিউটার শুধু জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যই নয়। কম্পিউটারে খেলাধুলা, কবিতা লেখা, সুর সৃষ্টি করা, ভাষা অনুবাদ করা– এগুলোও আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার ঃ আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাংলাদেশের তরুণদের কম্পিউটারে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। কম্পিউটারে পিছিয়ে থাকলে আমরা সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে যাব। বাংলাদেশে পরিকল্পনা, বাজেট, বন্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই কম্পিউটার বিরাট অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী কম্পিউটারের যে চাহিদা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সফটওয়্যার রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।

পরিবেশ দূষণ

সূচনা ঃ আমাদের চারপাশে যা আছে, তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের চারপাশে আছে আলো, বাতাস, মাটি, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, মানুষ জন, বন্য প্রাণী, ও আরও নানান কিছু। এসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এ পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর স্বাভাবিক বিকাশ হয়ে থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে আছে ভারসাম্য। পরিবেশের এ ভারসাম্য নষ্ট হয় পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পয়:নিষ্কাশণের অব্যবস্থা, যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ফসলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদি প্রতিনিয়তই পরিবেশকে দূষিত করছে। পরিবেশের এই দূষণ মানুষ ও প্রাণীর জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করেছে।

পরিবেশ দূষণের শুরু ঃ আসলে যেদিন থেকে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে পরিবেশের দূষণও শুরু হয়েছে। আদিম মানুষ যেদিন, আগুন জ্বালাতে শিখল সেদিন থেকেই সম্ভবত পরিবশে দূষণের শুরু। এরপর যা মানুষ করেছে – যেমন বন কেটে বসতি তৈরি করেছে, গ্রাম ও শহরের পত্তন করেছে, ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করেছে কীটনাশক, ব্যবহার করেছে রাসায়নিক সার, এর সব কিছুতেই পরিবেশ দূষিত হয়েছে। এরপরে আছে কলকারখানা স্থাপন, নানান রকমের পেট্রোল চালিত গাড়ি, জাহাজ, শিল্পকারখানার বর্জ্য, সবশেষে আনবিক ও পারমানবিক বোমার পরীক্ষা ও প্রয়োগ পৃথিবীর পরিবেশকে করেছে দূষিত ও বিপন্ন। এর ফলে ধরিত্রীর মানুষ ও জীবকূল আজ মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া ঃ পরিবেশ দূষণকে মূলত ৩টি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে – বাতাস, পানি ও শব্দ দূষণ। জীবনের জন্য যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা বাতাস। এ বাতাস যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া ও ধূলাবালি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি বাতাস দূষিত করে। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে এক ধরনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার নিঃসরণ ঘটে। এই বিষাক্ত ধোঁয়ায় থাকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন। এ ধোঁয়া মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধোঁয়ার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, চোখ জ্বালাপোড়া, মাথাধরা ইত্যাদি রোগ হতে পারে। ধুলাবালি রোগজীবাণু বহন করে। আনবিক ও পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা অঙ্গহানি ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে। ক্যান্সার এর মত রোগও সৃষ্টি করে।

পানি দূষণে খাল-বিল, নদী ও জলাধারের পানি দূষিত হয়। নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন, কল কারখানার বর্জ্য, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক সার, সমুদ্রে তেলবাহী জাহাজের তেল পানিতে মেশার ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। এ বিরূপ পরিবেশে নদী ও সমুদ্রের জলচর প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। কথায় বলে পানির অপর নাম জীবন। এটা সত্য শুধু মানুষের জন্য নয় অন্যান্য প্রাণীর জন্যও সত্য। সেই পানি দূষিত হলে জীবন ধারণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। কারণ পানি রোগ জীবানু বহনের প্রধান মাধ্যম।

যানবাহনের বিকট শব্দ, হর্ণের শব্দ কলকারখানার শব্দ, মাইকের চিৎকার, বোমা ও অস্ত্রের শব্দ এগুলো শব্দদূষণ ঘটায়। এগুলো থেকে মানুষের নিদ্রাহীনতা, মাথা ব্যথা, স্নায়বিক ও মানসিক নানাবিধ রোগের জন্ম হয়।

প্রতিকার ঃ প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতার কারণেই পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসছে। পৃথিবীব্যাপী আজ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ রক্ষার। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট মানুষের রোগ-শোক, জীবন, অর্থ ও সম্পদের অপচয় এগুলো থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন প্রকৃতির ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। জনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় যেমন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সেই সঙ্গে, কীটনাশক রাসায়নিক সার প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করে প্রাকৃতিক অজৈব সার ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানার বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে অথবা জলাশয়ে না ফেলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। গাড়ীর কালো ধোঁয়া নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। বসতি অঞ্চলে কোন শিল্প কলকারখানা গড়তে না দেওয়া ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি পরিবেশকে উন্নত করার জন্য কাজও আমাদের করতে হবে। নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ঠিক রাখতে হবে। বনজ ভূমির এলাকা বাড়াতে হবে, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি পরিবেশ উন্নত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক।

দেশে-দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন কানুন চালু হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবে পরিবেশ রক্ষার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে বিশ্ব পরিবেশের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। আমাদের দেশেও প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং কঠোরভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করতে হবে।

উপসংহার ঃ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসযোগ্য রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখতে হবে। প্রত্যেক দেশেরই এ ব্যাপারে দায় দায়িত্ব আছে। পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককেই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা

সূচনা ঃ মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে যেয়ে কবিয়াল রামনিধি গুপ্ত বলেছিলেন –

"নানা দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?"

না, স্বদেশী বা মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। এক সময় বিতর্ক ছিল – শিক্ষার মাধ্যম কি হবে বাংলা ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষা। এ বিতর্কের আজ অবসান হয়েছে। তর্কাতীত ভাবে আজ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে।

পটভূমি ঃ আমাদের দেশে আধুনিক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় ইংরেজ আমলে। দীর্ঘ বিতর্কের পর এদেশবাসীকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি বড়লাট বেন্টিঙ্কের আমলে গৃহীত হয়। তখন থেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষার প্রচলন শুরু হয়। তবে সে সময়ও ইংরেজ শাসকদের একটি অংশ ও দেশীয় শিক্ষিত জনের একটি অংশ মনে করতেন মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বিভাগোত্তর কালেও শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে ইংরেজির আধিপত্য ছিল প্রবল। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মাতৃভাষা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের সকল কাজে এবং শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে বাংলার দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বাঙালিরী স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশ লাভ করে এবং সংবিধানে রাষ্ট্রীয় সমস্ত কাজ কর্মে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানে মাতৃভাষা বাংলা স্বীকৃত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রকৌশল, চিকিৎসা, বিজ্ঞান চর্চায় ইংরেজি ভাষা প্রধান মাধ্যম।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ভাষার মাধ্যম অবশ্য প্রধানত বাংলাই। অথচ সর্বস্তরে বাংলা হওয়া উচিত ছিল শিক্ষার মাধ্যম।

শিক্ষার মাধ্যমহিসাবে বিদেশী ভাষা ঃ উন্নত দেশের ভাষা অনেক সময়ই স্বল্পোন্নত দেশের শিক্ষার মাধ্যম হতে দেখা যায়। অতীতে অনেক সময়ই বিজয়ী শাসকের ভাষাকে বিজিত ও শাসিত মানুষের শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কাজের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে তা সাধারণত সার্বজনীন হয় না। বিদেশী ভাষা শেখার যে উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থা প্রয়োজন তাও অনেক সময় থাকে না। ফলে ভাষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বরাবরই অদক্ষ থেকে যায়। ফলে শিক্ষার্থী মুখস্থ করতে বাধ্য হয়।

বিদেশী ভাষাচর্চার আমরা বিরোধী নই। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হওয়া উচিত। কারণ মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা আসলে তবেই, অন্য ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় যত সহজে বিদ্যাচর্চা করা সম্ভব বিদেশী ভাষায় তা হয় না। বিদেশী ভাষায় জ্ঞানচর্চার জন্য যে সময় ব্যয় করতে হয়ে তার অর্ধেক সময়েই মাতৃভাষায় সে জ্ঞানচর্চা করা যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র ও নিরক্ষর। এদেরকে সাক্ষর করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। এদের অধিকাংশেরই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা নেই এবং অধিকাংশকে দেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যদি বাধ্যতামূলক একটি বিদেশী ভাষা শেখাতে হয় – তা হবে নিতান্তই অপচয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। বিদেশী ভাষার বাতাবরণ সৃষ্টি করে মানুষকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত। দেশের সর্বত্র যদি শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হয় তবে উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা। কেউ কেউ অবশ্য এরকম যুক্তি দেখান যে বাংলা ভাষা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মত উপযুক্ত নয়। বাংলা ভাষায় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গ্রন্থের অভাব, পরিভাষার অভাব ইত্যাদি। এ সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় কোন ভাষা তো এসব চর্চার উপযোগী হয়ে তৈরি থাকে না। যখন যে ভাষায় জ্ঞানশাখার বিষয়টি চর্চা হয়, তখন সে ভাষা ঐ বিষয়টি চর্চার উপযোগী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চীনা ও জাপানি ভাষার উদাহরণ সহজেই উল্লেখ করা যায়।

উপসংহার ঃ প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব একটা প্রাণশক্তি থাকে। বাংলা ভাষারও তা আছে। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অনন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের সর্বপর্যায়ে বাংলা ভাষার দক্ষতা ও যোগ্যতা পূর্ণ বিকাশের অপেক্ষায় আছে। যাঁরা যে বিষয়টি চর্চা করেন তাদের সাফল্য ও আন্তরিকতার উপরই নির্ভর করে বাংলা ভাষাকে ঐ বিষয়ে বিকশিত করার দায়িত্ব।

আমরা আশা করবো শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য যথার্থ বাহন হবে মাতৃভাষা বাংলা।

শ্রমের মর্যাদা

সূচনা ঃ মানুষে জীবনে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রম দিয়েই মানুষ তার ভাগ্যকে জয় করে। শ্রম দিয়ে মানুষ যেমন আয় উন্নতি বাড়াতে পারে – আর্থিক উন্নতি করতে পারে তেমনি কঠোর শ্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শ্রমের মর্যাদা দিতে চায় না। কায়িক পরিশ্রমকে অনেকে অবহেলার চোখে দেখেন। ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে এ দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

শ্রমের গুরুত্ব ঃ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়। আর ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে হয় শ্রম দিয়ে তাই বেঁচে থাকার জন্য শ্রম অপরিহার্য। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম ছিল সামাজিক দায়িত্ব। সভ্যতার অগ্রগতির

সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব আর থাকেনি। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ মতো মানুষ নিজস্ব শ্রমের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান পেশা।

অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমের নানা বিভাজন করা হয়েছে। কায়িক পরিশ্রমকে সেখানে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। তাছাড়াও শ্রমের কোনো কোনোটিকে অমর্যাদাপূর্ণ আবার কোনটিকে মর্যাদাপূর্ণ বলে জ্ঞান করা হয়। ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজন করে চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করা হয়েছিল। পেশা দিয়ে সেকালে উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আমরা জানি, যে সমস্ত দেশ উন্নতি করেছে সে সমস্ত দেশ ও সমাজে সকল শ্রমকে সমমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কোন শ্রম ও কাজকেই সেখানে ছোট করে দেখা হয় না বা অবজ্ঞা করা হয় না। শ্রমের ক্ষেত্রে এটিই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শ্রমের গুরুত্ব ঃ শ্রমের উপর নির্ভর করেই মানব সমাজ বেঁচে থাকে। তাই সমাজে শ্রমের গুরুত্ব অনেক বেশি। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি হয় শ্রমবিমুখ তবে সে সমাজের উন্নতি হয় না। অনুন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে প্রত্যেকটি নাগরিকের কঠোর শ্রম করার মানসিকতা থাকা দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত জীবনেও শ্রমের গুরুত্ব খুবই বেশি। ব্যক্তির আর্থিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য কঠোর শ্রমের বিকল্প কিছু নেই। পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। সৌভাগ্যের অর্জন করতে হলে কঠোর শ্রমের অবশ্যই প্রয়োজন।

মানব সমাজে অসংখ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা লক্ষ্য করা যায়। মানুষে মানুষে শিক্ষা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পার্থক্য থাকে। সে অনুযায়ী পেশা নির্ধারিত হয়। যে পেশায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন সেখানে নিরক্ষর অথবা অদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে কাজের তারতম্য থাকবে। আবার কর্মের ক্ষেত্রে দেখা যাবে কেউ অল্প পরিশ্রম করেই জীবিকা অর্জন করছে আবার কেউ কঠোর পরিশ্রম করেও ভালভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারছে না। এক্ষেত্রে সমাজ তার ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে কাজকর্ম ও পেশার জন্য উচ্চ নীচু ভেদাভেদ না রেখে সবাই কর্মী হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। জীবিকা ও পেশার পার্থক্য থাকলেও সবাই কর্মী।

শ্রমবিমুখতা ঃ মানুষের সমাজ ও জীবনের জন্যই শ্রমের প্রয়োজন আছে। তাই শ্রমবিমুখতা কখনও কাম্য নয়। শ্রম বিমুখ হলে ব্যক্তির যেমন উন্নতি বন্ধ হয় এবং তেমনি রাষ্ট্র সমাজেরও ক্ষতি হয়। অবকাশভোগী শ্রমবিমুখ মানুষেরা সাধারণত সুবিধাবাদী হয় অন্যের শ্রমকে তারা চুরি করে সুবিধা লাভ করে। এরা সমাজের পরজীবী। পরজীবী বা পরগাছা যেমন অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে শ্রমবিমুখ মানুষ তেমনি সমাজের শ্রমকে শোষণ করে বেঁচে থাকতে চায়। শ্রমবিমুখ মানুষ সমাজের ক্ষতি করে ও উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উপসংহার ঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে যে কোন ধরনের শ্রমই হোক না কেন তা অবজ্ঞার নয়। দেশের প্রতিটি কর্মী, যে যে কোন পেশায় অথবা কর্মে নিয়োজিত থাকুন না কেন তিনি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন। জেলে, তাঁতি, চাষী কেউই ছোট কর্ম করছেন না। কবির ভাষায়–

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

বিরাট এই পৃথিবীর কর্মভার বহন করছেন এই কর্মীরা। তারাই মানবসভ্যতা নির্মাণ করেছেন। মানব সভ্যতা তাঁদেরকে অবলম্বন করেই টিকে আছে। সুতরাং তাঁরাই জীবনের ও সমাজের মহৎ কর্মী। এ কর্মীদের শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হবে। আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা সীমাহীন।

আর্থিক উন্নয়ন, রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা দরকার। সকলের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা যদি আমরা দিতে পারি তবে অচিরে বাংলাদেশ একদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নতদেশে পরিণত হতে পারবে।

অনুসারী রচনা

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

শিষ্টাচার

ভূমিকা ঃ যে সব গুণ মানুষকে মহৎ করে, তার মধ্যে শিষ্টাচার একটি। অন্য মানুষের সঙ্গে ভদ্র আচরণ বা ব্যবহার, সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ করা ইত্যাদিকেই শিষ্টাচার বলে। যার ব্যবহারে শিষ্টাচার নাই তাকে কেউ পছন্দ করে না। রূঢ় ব্যবহার, কর্কশ কণ্ঠস্বর, দুর্বিনীত ভঙ্গি মানুষের মন্দ দিককে প্রকট করে। অন্যদিকে সুবোধ আচরণ, বিনীত মনোভাব, মধুর ব্যবহার, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ও লৌকিকতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষের জন্য শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় গুণ। শিষ্টাচার মার্জিত রুচি ও মনকে প্রকাশ করে।

Courtesy Costs nothing একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এর অর্থ ভদ্রতা বা সৌজন্যের জন্য কিছু খরচ হয় না। অত্যন্ত সত্য কথা যে মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে, নিজের কোন ক্ষতি হয় না অথবা কিছু ব্যয় হয় না। পরিচিত অথবা অপরিচিত যেই হোন না কেন, তার প্রতি শিষ্টোচিত ব্যবহার করা উচিত।

সমাজে শিষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শত্রুতার নয় তা বন্ধুত্বের। শিষ্টাচার বা সৌজন্যমূলক আচরণ মানুষে-মানুষে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুশীল আচরণ প্রীতি ও ভালবাসার প্রকাশ। সামাজিক লৌকিতা প্রকাশ করাও বিধেয়। সমাজে যা প্রচলিত নয় বা যে আচরণ কাম্য বলে বিবেচিত নয়, তা পরিহার করা দরকার। সমাজের লৌকিকতা পালন ও শিষ্টাচাররের অন্তর্ভুক্ত।

শিষ্টাচার মানব জীবনের একটি গুণ, যা মানুষ চর্চার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। শৈশব থেকেই পারিবারিক পরিবেশে এর চর্চা আরম্ভ হলেই ভাল। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তিগত গুণ অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র, মা-বাবার আচরণ দেখে শিশুরা তাতে আকৃষ্ট হয়। আদব-কায়দা, ভদ্রতা, লৌকিকতা, বাকসংযম ইত্যাদি গুণ শৈশবকালে পারিবারিক পরিবেশেই শিক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তী জীবনে যে শিশুটি বড় হয়ে শিষ্ট আচরণ করবে, শৈশবেই তার এ শিক্ষা শুরু না হলে এটি অর্জন করা কঠিন।

শিষ্টাচারকে অনেকে দুর্বলতা বলে ভুল করেন। আসলে শিষ্টাচারের মধ্যে দুর্বলতা কোন সম্পর্ক নাই। মানবিক অন্যান্য গুণের সঙ্গেও শিষ্টাচারের কোন বৈরীতা নেই। যেমন সত্যকথা বলা একটি গুণ। অনেক সময় সত্যভাষণ রূঢ়তা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যভাষণটি যদি পক্ষপাতহীন ও স্বাভাবিকভাবে পরিবেশন করা হয় তবে তা শিষ্টাচারবর্জিত মনে হয় না।

সুনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিষ্টাচার। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে অনেককেই দেখা যায় কঠোর ও অশালীন ব্যবহার করতে। ছিন্ন পোশাক, মলিন বস্ত্র পরিহিত বলেই সে লোকটির প্রতি তর্জন-গর্জন করতে হবে– রিকশাওয়ালা বা ঠেলাগাড়ির চালক বলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে হবে এমনটি শিষ্টাচার বর্জিত। গাড়ির ঠেলাঠেলির মধ্যে বৃদ্ধটিকে একটু জায়গা দিলে নিজের খুব একটা কষ্ট হয় না। বরঞ্চ এ সৌজন্যবোধ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। সহনশীলতা, ধৈর্য এসব গুণই শিষ্টাচারের অনুষঙ্গ। মানুষর প্রতি ভদ্র আচরণ, সহনশীলতা ও ধৈর্য দিয়ে অন্যের কথাকে বুঝতে চেষ্টা, অন্যকে সাহায্য করা, আন্তরিকতা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা ইত্যাদি শিষ্টাচারেরই অংশ। পথে ঘাটে, ভ্রমণে-বিশ্রামে, গৃহে অথবা কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই মধুর আচরণ মানুষকে ব্যক্তিত্বশালী প্রিয় মানুষে পরিণত করতে পারে। পৃথিবীতে যাঁরা কর্মে ও ধ্যানে, বিদ্যায় ও দক্ষতায় নিজেদের অনন্যতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা সবাই ভদ্র ও শিষ্টাচারের জন্যও আদর্শ স্থানীয়।

উপসংহার ঃ অন্যকে সম্মান করতে পারলে নিজেও সম্মানিত হওয়া যায়। প্রবাদতুল্য এ বাণীকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। আপনার মধুর ব্যবহার আপনার চারপাশের মানুষকে প্রভাবিত করে। শিষ্টাচার তাই আমাদের জীবন ও সমাজে অবশ্যই চর্চার যোগ্য একটি সৎ গুণ।

অনুসারী রচনা

- ভদ্রতা
- সৌজন্যবোধ

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা ঃ দেশভ্রমণ মানুষের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। দেশভ্রমণ মানুষকে আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। দেশভ্রমণ মানুষের মনকে উদার ও উন্মুক্ত করে। এ পৃথিবী যে মানুষের মিলন মেলা দেশভ্রমণ তা বলে দেয়। অপরপক্ষে ঘরকুণো লোক নিজের রচনা করা বৃত্তে আটকে পড়ে বৃহত্তর জীবন থেকে ছিটকে পড়ে।

দেশভ্রমণ কি?

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানই দেশভ্রমণ। দেশে-দেশে অর্থাৎ শুধু বিদেশ নয়, নিজ দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করাও দেশভ্রমণ। আমরা অনেক সময় নিজের দেশটাকেও ভাল করে দেখার সুযোগ করে নিতে পারিনা। এটার অন্যতম কারণ আমাদের অলসতা উদ্যমের অভাব। নিজের দেশকে ভাল করে জানা অবশ্যই আমাদের কর্তব্য। বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। কিন্তু আমরা সবাই কি সমুদ্র দেখেছি, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি? আমরা অনেকেই আমাদের দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সাঁওতাল, গারোদের কখনও দেখিনি, তার স্বতন্ত্র জীবনধারা সম্পর্কেও জানিনা। তাই প্রথমেই নিজেদের দেশকে প্রথমে জানা দরকার। তারপরেই বিদেশ ভ্রমণ করা দরকার। এই পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্য। একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য হয়তো দেখার সুযোগ হয় না। তবুও যতটুকু সম্ভব তা দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও দেশভ্রমণ

আমরা শিশুকালেই বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করি। শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে, কৈশোর, যৌবন পর্যন্ত তাদের নানাবিধ শিক্ষা, বিদ্যা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করে তুলতে চেষ্টা করি। শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয় বটে তবে তা পুৎজিগত ও সঙ্কীর্ণ। দেশভ্রমণের সাহায্যে এ সঙ্কীর্ণ শিক্ষাকে বিস্তৃত ও ফলপ্রসু করা যায়। পুঁজিগত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল বিদ্যারই দর্শকের মনে যে গভীর ও বিস্তৃত চাপ ফেলে যায় তা পুঁজিগত বিদ্যার প্রভাবকে সহজে ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষার সঙ্গে তাই দেশভ্রমণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আনন্দ ও দেশভ্রমণ

মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ আনন্দ। নিজের ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে। তখন নতুন মানুষ, নতুন জনপদ ও নতুন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাবার জন্য মানুষের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করার জন্য দেশভ্রমণ অতি প্রয়োজনীয়। দেশভ্রমণ মনকে নবীন করে। দেশভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়। বাঁচার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, বাঁচার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। দেশভ্রমণের আনন্দ তাই তুচ্ছ করবার বিষয় নয়।

দেশভ্রমণ- সেকাল আর একাল

মানুষ কতকাল থেকে দেশভ্রমণ করছে তা বলা মুস্কিল। তবে দেশভ্রমণের প্রথা অনেক প্রাচীন। প্রাচীন কালের ইতিহাসেও দেশভ্রমণকারী পর্যটকদের বিবরণ পাই। অন্য মানুষকে জানা, অজানাকে জানা, নতুন নগরী, পাহাড়-

পর্বত, ঝণা, জলস্রোত, নিসর্গ ও দেশকে জানার জন্যই প্রাচীনকালে মানুষ দেশে দেশে পর্যটন করেছে। তখন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, রাস্তায় কোন যানবাহন ছিল না। রেল পথ, আকাশ পথ তখনও স্বপ্নেরও অতীত। তবুও মানুষের দেশ ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা সব বাধাকে তুচ্ছ করেছে। তখন দেশভ্রমণের তীব্র ইচ্ছার কারণ কবির ভাষায়-

"বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কতনা নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।"

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীময় যোগাযোগ বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব

সূচনা ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বলতম দিন। দিনপঞ্জির সব দিন ও তারিখ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সমান গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু এমন কিছু দিন, ক্ষণ, তারিখ থাকে, যা কোনদিন ভোলা যায় না। জাতীয় স্মৃতিতে এমনই ভাস্বর একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির উন্মেষ না হলে জাতি হিসাবে আমাদের আত্মপরিচয় সন্ধান সম্ভব হতো না। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের দিয়েছে আত্মপ্রত্যয়, জাতি হিসেবে উন্মেষের দিশা।

একুশে ইতিহাস

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি দেশের উদ্ভব ঘটে। আমাদের বাংলাদেশ ছিল সেই পাকিস্তানের একটি অংশ। পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক কায়দায় বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা শুরু হয়। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে ও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় ও সকল সভা সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন সভা করে ঐ ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য মিছিল করে। পুলিশ এই অসহায় ছাত্রছাত্রীদের উপর টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্চ ও গুলিবর্ষণ করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিবর্ষণে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শাহাদত বরণ করেন। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে সালাম, বরকত প্রমুখরা নিহত হয়েছিলেন, সেখানে গড়ে ওঠে শহীদ মিনার। সেটি আজ জাতীয় শহীদ মিনার।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ

১৯৫২ সালে ছাত্রজনতার উপর অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ বাঙালি নবজাগরণের সূত্রপাত করে। পাকিস্তানের প্রতি অনুমোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। বাঙালি অনুভব করে জাতীয় সত্তাকে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। '৬৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৭১ এ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের এ ঘটনাক্রমের সুতিকাগার ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আবাসভূমি হিসাবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

একুশে প্রেরণা

বাংলাদেশ যতদিন থাকবে গভীর আবেগ নিয়ে মানুষ একুশকে স্মরণ করবে। কারণ একুশের চেতনা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগ করতে শিখিয়েছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে শিখিয়েছে। একুশের প্রেরণাই আমাদের জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। একুশ না হলে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব হত না এবং মুক্তিযুদ্ধ হতো সুদৃঢ় পরাহত। এ কারণেই বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবছর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে একুশে ফেব্রুয়ারিকে। গভীর শ্রদ্ধায় নিহতদের স্মরণে ফুলের অর্ঘ্য অর্পণ করে শহীদ মিনারে।

উপসংহার

একুশের চেতনাকে আমাদের জাতীয় জীবনে সংরক্ষণ করতে হবে। এটি যেন গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত না হয় সেদিকে যথাযথ খেয়াল রাখতে হবে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে একুশের চেতনা থেকে সঞ্চারিত তা মনে রাখতে হবে। একুশ এর শহীদ মিনার আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহান চালিকা শক্তি। সে কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের যে কোন সমস্যা উত্তরণ হবে সহজ ও সরল। কবির সেই বিখ্যাত গানটি-

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

মনে রাখতে হবে এবং একুশের চেতনাকে চিরদিন লালন করতে হবে।

অনুসারী রচনা

- আমাদের ভাষা আন্দোলন
- একুশে চেতনা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	সংকেতের সাহায্যে নিচের রচনাগুলো লিখুন। প্রয়োজনে অন্যান্য বই-পত্রের সাহায্য নিন। শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রচনা লেখার ব্যাপারে আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্ন

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. সূচনা
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি?
৩. বাংলাদেশে কি ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে এর ক্ষয় ক্ষতি
৫. পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কিভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব
৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা
৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার সম্ভাবনা
৯. উপসংহার।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

১. সূচনা
২. সবার জন্য শিক্ষা
৩. সকলকে সাক্ষর করার মহান উদ্যোগ

৪. সাক্ষরতা অভিযানে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা
৫. সাক্ষরতার উপকারিতা
৬. জনশিক্ষা ও সাক্ষরতার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা
৭. রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতি
৮. সাক্ষরতা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে
৯. উপসংহার।

একটি ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা

১. সূচনা
২. কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পথে
৩. প্রকৃতির রুদ্ররূপ
৪. অন্ধকার রাত্রে আশ্রয়গ্রহণ
৫. ভুতুড়ে রাতের অভিজ্ঞতা
৬. পরবর্তী সকালে প্রকৃতির শান্তস্নিগ্ধ রূপ
৭. ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে জনজীবনে হাহাকার
৮. কৌতূহলী মানুষের ভিড়
৯. প্রকৃতির বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা
১০. উপসংহার।

একজন বেকারের আত্মকথা

১. সূচনা
২. বেকার কাকে বলে?
৩. জীবন ও জীবিকার সোনালী স্বপ্ন
৪. শিক্ষা শেষে চাকুরির অভাব
৫. চাকুরি প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতা
৬. কেন এই বেকারত্ব? কার দোষ?
৭. আত্মকর্মসংস্থানই আমার ভবিষ্যৎ
৮. নিজের জীবনকে নিজেই গড়তে চাই
৯. উপসংহার।

ট্রেনে ভ্রমণ

১. সূচনা
২. যাত্রারম্ভ
৩. ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র আচরণ
৪. জংশনে ভুল ট্রেনে উঠে পড়া ও পরে সংশোধন
৫. রাত দশটায় গন্তব্যে পৌঁছানো
৬. উপসংহার।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. সূচনা
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা কি?
৩. প্রচলিত শিক্ষা সমাজের চাহিদা পূরণে অক্ষম কেন?
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

৫. বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষা
৬. উপসংহার।

পরীক্ষায় দুর্ণীতি

১. সূচনা
২. দুর্নীতির বর্তমান অবস্থা
৩. দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ
৪. দুর্নীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়
৫. সমাজের সকলের দায়িত্ব
৬. শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন
৭. উপসংহার।

বাংলাদেশের পাখি

১. সূচনা
২. বাংলাদেশে কি কি পাখি দেখা যায়
৩. পাখিদের বৈশিষ্ট্য
৪. পাখি ও মানুষ
৫. পাখি পরিবেশ সংরক্ষণ করে
৬. উপসংহার

পহেলা বৈশাখ

১. সূচনা
২. পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ
৩. নববর্ষ উদযাপনের রীতি- দেশে ও বিদেশে
৪. নববর্ষে বাংলাদেশের প্রকৃতি
৫. উৎসব
৬. তাৎপর্য
৭. উপসংহার।

নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সূচনা
২. নাগরিক কাকে বলে
৩. নাগরিক অধিকার
৪. নাগরিকের দায়িত্ব
৫. উপসংহার।